ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একবিংশতিতম সংখ্যা,
ডিসেম্বর ২০০১, পৌষ ১৪০৮

বাংলাদেশে দারিদ্রের গতি-প্রকৃতি এবং দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রম

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান *

Trends of Poverty in Bangladesh and Efforts of Government and Non-Government to Alleviate Poverty

-A K M Mahbubuzzaman

Abstract : Poverty is an important and major problem of Bangladesh. Government is actively considering and taking steps to reduce the magnitude of poverty. In this article types of poverty including poverty cycle, scenario of poverty in Bangladesh, trends of poverty, programmes for poverty alleviation by government and non-government and suggested measures have been discussed followed by conclusion.

ভূমিকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্র দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। প্রায় ১৩.৪ কোটি (শুমারী, ২০০১) মানব সমৃদ্ধ ১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটারের এই দেশটি জর্জরিত বিভিন্ন সমস্যায়, দারিদ্র তার মধ্যে অন্যতম। মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না প্রায় অর্ধেক জন গোষ্ঠীর। উপরন্তু, প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগে বিপর্যস্ত হচ্ছে বার বার। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩০ বছর পরেও দারিদ্রের বিবেচনায় পৃথিবীর ৫ম দরিদ্রতম দেশ হিসেবে আজও পরিগণিত। ২০০১ সালে এর মাথা-পিছু বার্ষিক আয় ৩৯০ মার্কিন ডলার মাত্র (অর্থ মন্ত্রণালয়-২০০১), যেখানে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৪,৬২০ মার্কিন ডলার।

---

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট ও পিএইচ.ডি. ফেলো, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের বর্তমান মাথা-পিছু বার্ষিক আয়কে যদি মাসিক আয়ে বিভক্ত করা হয়, তবে তা হবে ৩২.৫০ মার্কিন ডলার, টাকার অংকে বর্তমান বাজার মূল্যে প্রায় ১,৮৫২ টাকা। বর্তমান বাজার মূল্যে এই টাকায় একজন ব্যক্তির মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে, এই গড় আয় নিরূপিত হচ্ছে স্বল্প সংখ্যক কোটিপতি এবং অধিক সংখ্যক স্বল্পবিত্ত ও নিঃস্ব মানুষের আয়ের যোগফলের গড়ে। সুতরাং বিশাল জনগোষ্ঠীর (৪০.৫৬%) গড় মাসিক আয় ৫০০ টাকার নিচে (বিবিএস-১৯৯৯) অবস্থান করায় দারিদ্র সমস্যা প্রকটতর রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে এই দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। কিন্তু তখনকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধির নিম্নহার এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে খুব বেশী সুফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে বিরাজমান দারিদ্র এদেশের উন্নয়নের পক্ষে প্রকট বাধা রূপে বিদ্যমান। বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশে দারিদ্রের গতি প্রকৃতি এবং দারিদ্র বিমোচনে সরকারী ও এনজিও প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দারিদ্র সংক্রান্ত পর্যালোচনা

'দারিদ্র বিমোচন' বিষয়টি সর্বপ্রথম আলোচিত হয় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর। মহামতি লেনিন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব দেখে সেই দেশে 'দারিদ্র ভাগাভাগি' বা 'Poverty sharing' চালু করেন। অর্থাৎ সম্পদ যেটুকু আছে তাই সকলে মিলে স্বল্প অথচ সমান পরিমাণে ভাগ করে ভোগ করার নীতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহে দারিদ্রের সরব উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তখন থেকে দারিদ্র বিষয়ক অলোচনা সে সব দেশে আরম্ব হয় এবং ১৯৫৮ সালে আমেরিকান অর্থনীতিবিদ গলব্রেথ তাঁর 'দারিদ্র বিমোচন' তত্ত্ব প্রদান করেন। তাঁর তত্ত্বেও বলা হয় যে, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র বিমোচনও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যিক পূর্বশর্ত।" তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ ষাটের দশক থেকে 'দারিদ্র বিমোচন' বিষয়ে আলোচনা, নীতি ও কার্যক্রম আরম্ভ করে।

দারিদ্রের প্রকারভেদ

দারিদ্র প্রধানত দুই প্রকার ঃ

ক. অনাপেক্ষিক দারিদ্র (Absolute Poverty) : এই দারিদ্র এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ তার ন্যূনতম শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। অনাপেক্ষিক দারিদ্রের আবার দু'টি ভাগ রয়েছে। দারিদ্র ও চরম দারিদ্র। এটি নির্ধারণ করা হয় প্রধানত দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাপ দ্বারা। বিশ্ব ব্যাংকের মতে ২১২২ এবং জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর মতে ২১৫০ কিলো ক্যালোরি যদি একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিদিন গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, তবে সে দারিদ্রের মধ্যে আছে। আর এর পরিমাণ যদি ১৮০৫কি. ক্যালোরির নিচে চলে আসে তবে সে চরম দারিদ্রের অন্তর্ভুক্ত।

খ. আপেক্ষিক দারিদ্র (Relative Poverty) : আপেক্ষিক দারিদ্র শারীর বৃত্তীয় চাহিদা পূরণের (২১২২/২১৫০ কি. ক্যালোরি গ্রহণ) পরের একটি অবস্থা, যা কোন সমাজের আয় ও সম্পদ বিতরণে একজন ব্যক্তি বা পরিবারের সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করে।

উদাহরণত, আমেরিকায় ১৫% পরিবার দরিদ্র বলে বিবেচিত হয়, যাদের আয় ও সম্পদ বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। এ বিষয়ে মনীষী কার্লমার্কসের একটি উদাহরণ খুব বেশী আলোচিত হয়। একজন ব্যক্তি কুঁড়েঘরে সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করতো। তার কোন অভাববোধ ছিলনা। পরে সেখানে তার একজন প্রতিবেশী এসে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো। তখন থেকে ঐ কুঁড়েঘরবাসীর মর্ম পীড়া আরম্ভ হলো এবং সে অনুভব করলো যে সে দরিদ্র। আপেক্ষিক দারিদ্র প্রধানত রাষ্ট্রের সম্পদ বণ্টনে অসমতা ও বঞ্চনার কারণে সৃষ্টি হয়।

এছাড়া নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক দারিদ্রের সমন্বয় ঘটিয়ে দারিদ্রের একটি নতুন পরিমাপ ব্যবহার করেছেন। এই পরিমাপটিকে 'সেন সূচক' (Sen index) বলা হয়।

দারিদ্রের দুষ্ট চক্র

দারিদ্র একটি সামজে বিদ্যমান থাকলে সেই সামজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম হয়। ফলে বেকারত্ব ও স্বল্প আয়ের জন্ম হয়। এর পাশাপাশি উচ্চ জন্মহার ও শ্রমের বাড়তি

যোগান যুক্ত হয়ে বেকারত্বকে তীব্রতর করে তোলে। ফলে পুনরায় বৃদ্ধি পায় দারিদ্র এবং সৃষ্টি করে স্বল্প উৎপাদনশীলতা। এর সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মস্পৃহার কমতি দেখা দেয়। দেখা দেয় ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে অদক্ষতা এবং ফলস্বরূপ প্রকট দারিদ্র। একেই বলে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র।

বাংলাদেশে দারিদ্রের চিত্র

বাংলাদেশের দারিদ্র পর্যালোচনা করতে গেলে প্রকৃত তথ্যের প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হয়। মাত্র কয়েকটি সূত্র থেকে তথ্য পাওয়া যায়, যে গুলোর যথার্থতা নিয়ে স্বদেশী ও বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠানই প্রশ্ন উত্থাপন করে। তবুও ঐ সব উৎসের উপর নির্ভর করা ছাড়া ব্যাপক তথ্য প্রাপ্তির তেমন আর কোন সুযোগ নেই। এখানে উৎসসমূহ আলোচিত হলো।

তথ্য প্রাপ্তির উৎসসমূহ

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) : বাংলাদেশে তথ্য প্রাপ্তির সবচেয়ে বড় উৎস এটি। এর বিভিন্ন শুমারী ও জরীপ কার্যক্রম নিম্নরূপ :

(ক) আদম শুমারী প্রতিবেদন (২০০১ সালের প্রতিবেদন অদ্যাবধি অপ্রকাশিত) (খ) খানা ব্যয় জরীফ (House Hold Expenditure Survey) (গ) বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক জরীপ। যেমনঃ কৃষি, আয়, শ্রম, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ক। (ঘ) ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে 'মৌলিক চাহিদা খরচ প্রক্রিয়া (Cost of basic needs method)' নামক চলমান গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, বস্ত্র ও খাদ্য অন্তর্ভুক্ত। এই গবেষণায় ক্যালোরি পরিমাপের পরিবর্তে 'সি বি এন এম' পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিমাপ করা হচ্ছে।

২। পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান : মাঝে মাঝে এই প্রতিষ্ঠান পুষ্টি ও খাদ্য (ক্যালোরি গ্রহণসহ) সংক্রান্ত জরীপ করে থাকে।

৩। অর্থ মন্ত্রণালয় ঃ এই মন্ত্রণালয় 'বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা' প্রকাশ করে থাকে।

৪। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ : এই প্রতিষ্ঠান 'Analysis of Poverty Trends' নামক একটি দারিদ্র পরিমাপ প্রকল্প ১৯৮৯-৯০ সালে

পরিচালনা করেছে। ২০০১ সালে আরেকটি প্রকল্প পরিচালনা আরম্ভ করেছে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান থেকে নমুনা এলাকা ভিত্তিক দারিদ্রাবস্থা এবং বিমোচনের প্রকল্পসমূহের স্থায়িত্ব ও ফলপ্রসূতা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৫। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা : এ সব সংস্থা থেকে দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন বার্ষিক বা দ্বি-বার্ষিক আকারে প্রকাশিত হয়।

৬। ব্যানবেইস : শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী বার্ষিক বা দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশ করে।

দারিদ্র সংক্রান্ত কতিপয় ক্ষেত্রের তথ্য

বাংলাদেশে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির হার

বিগত দশকে বাংলাদেশে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির হার সারণি-১এ দেখানো হলো।

সারণি-১

বাংলাদেশে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির হার

পরিমাপের ভিত্তি বছর	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
১৯৮৪-৮৫ সালের হিসাব	৩.৪	৩.৯	৫.৩৫	৫.৯০	৫.৬৬	৬.০৩
১৯৯৫-৯৬ সালের হিসাব	৩.৩৪	৫.০৪	৪.৬২	৫.৩৯	৪.৮৮	৫.৫০

সূত্র : জাতীয় আয় শাখা, বি বি এস (১৯৯৯) (প্রকাশিত-২০০১)

খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্তি

বাংলাদেশে জনগণ গড়ে এক বছরে কী পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য লাভ করে, তার চিত্র সারণি-২-এ লক্ষণীয়।

সারণি-২

কতিপয় খাদ্য সামগ্রীর বার্ষিক মাথাপিছু প্রাপ্তির পরিমাণ (কিলোগ্রাম হিসেবে)

খাদ্য সামগ্রীর নাম	সাল	
	১৯৮৭-৮৮	১৯৯৭-৯৮
খাদ্য শস্য	১৬৪.২০	১৫৩.৬০
চা	০.১০	০.২৩
পেঁয়াজ	১.৪০	১.৩০
মরিচ	০.৪৬	০.৪১
ডাল	৫.৬০	৪.৯০
ভোজ্য তেল	১.৪৫	২.১৬
চিনি	২.৯০	২.৫৮
গুড়	৪.৭০	৪.১২
লবণ	৫.১৯	৫.৬৯
মাংস	৩.১৮	৫.০৫
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য	৯.৫০	১৩.১০

সূত্র : বিবিএস-১৯৯৯ (প্রকাশিত-২০০১)

বাংলাদেশে বর্তমানে জনগণ সারা বছর যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য আহার হিসেবে লাভ করে, তার গড় মাথা পিছু পরিমাণ সারণি-২-এ বিধৃত হলো। স্মর্তব্য যে, সারণির তথ্য কেবল ভোগের ভাগফল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে যারা দরিদ্র তারা এই পরিমাণ ভোগ করার সামর্থ (অর্থ) রাখেনা। কিন্তু বিবেচ্য বিষয় হলো, এত স্বল্প পরিমাণ ভোগ এদেশের দারিদ্রকে দীপ্যমান করে তোলে। এই সারণিতে মাছ প্রাপ্তির তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ডিম প্রাপ্তির হার ৮৭-৮৮তে ছিল বছরে ১৩টি, ৯৭-৯৮তে দাঁড়িয়েছে ২৩টি।

উল্লেখ্য, সারা বছরে প্রাপ্য ঐ পরিমাণ দ্রব্যকে ৩৬৫দিয়ে ভাগ করলে যে পরিমাণ দাঁড়াবে, তা দিয়ে ১৮০৫ কিলো ক্যালোরি লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। সে হিসেবে এদেশের সোয়া ১৩ কোটি মানুষই চরম দারিদ্রে অবস্থান করার কথা। কিন্তু ভাগ্যবান প্রায় ৫৯% পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করে নেয়, তাদের ক্যালোরির ঘাটতি পড়ে না। বাকী ৪১% Poorest of the poor হবার প্রতীক্ষায় দিন গোনে।

বস্ত্র

মৌলিক চাহিদাসমূহের অন্তর্গত বস্ত্র কেবল লজ্জা নিবারণের জন্যই নয়, বরঞ্চ শীত ও তাপ থেকে রক্ষার জন্যও প্রয়োজনীয়। বিগত ২৫ বছর ধরে এদেশের দরিদ্র জনগণ বিদেশী পুরাতন কাপড় ও শীত বস্ত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতো। রাষ্ট্রীয়ভাবে আমদানী কমে যাওয়ায় পুরাতন কাপড়ও এখন সহজলভ্য নয় এবং ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে বসেছে। বিবিএস-৯৯ এর তথ্যানুযায়ী ১৯৮৭-৮৮ সালে গড়ে প্রতি বছর মাথাপিছু পুরাতন কাপড় প্রাপ্তি ছিল ১ মিটার, ৯৭-৯৮ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ০.১০ মিটারে। অবশ্য নতুন কাপড়ের ব্যবহার ৯.৩মিটার থেকে ১২.৩ মিটারে উন্নীত হয়েছে।

বাসস্থান

"বাংলাদেশের পল্লী ও শহরের পরিবারসমূহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ১ কক্ষ বিশিষ্ট ঘরে বাস করে" (সাদেক, ১৯৯০ ঃ ৮১)। শহরের প্রায় ৩০% পরিবার বস্তিতে বাস করে। মাত্র ১টি কক্ষে স্ত্রী ও সন্তানসহ বাসকরা একটি অমানবিক অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। ২০০১ সালে সরকারী খাস জমিতে, রাস্তার পাশে, রেল লাইনের ধারে এবং ফাঁকা জমিতে বসবাসরত দরিদ্র পরিবারসমূহকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এরা এখন ভাসমান জনগোষ্ঠি, যাদের রাত কাটানোর কোন ব্যবস্থাই নেই।

শিক্ষা

১৯৯০-৯১ সালের নিরীক্ষাধর্মী এবং ১৯৯২ সালে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' কার্যক্রম এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মহিলাদের অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার ফলে বিগত ১০ বছরে শিক্ষার হার ৩২% থেকে ৬২% এ উন্নীত হয়েছে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০১)। তবে এখনও প্রায় ৩ কোটি বয়স্ক মানুষ অশিক্ষিত এবং ৫০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। অপর একটি চিত্র এই যে,

১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী ৫-৯ বছর বয়স্কদের ৯৫% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ১০-১৪ বছর বয়স্কদের ৩৪% উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৫-২০ বছর বয়স্কদের ৬% মাত্র কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত (বিবিএস-৯৯)। বাংলাদেশের গড়ে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ৭০জনে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৯জনে, কলেজ পর্যায়ে ৩৩ জনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ২৪ জনে ১জন শিক্ষক রয়েছেন।

স্বাস্থ্য

এদেশে নব জাতকের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৯৯০ সালে ছিল ৯৪জন, ১৯৯৮ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৫৭ জনে দাঁড়িয়েছে। শিশু মৃত্যুর (১-৪ বছর) হার ১৯৯৮ সালে শতকরা ৬.৩ (বিবিএস-১৯৯৯)। ১৯৯৮ সালের হিসেব অনুযায়ী এদেশে Crude birth rate ১৯.৯ এবং Crude death rate ৪.৮% । যদিও এটি সহনীয় মাত্রায় এসেছে বলে অনেকেই দাবী করেন, কিন্তু এটি কাঙ্ক্ষিত নয় কোনক্রমেই। এদেশের মানুষকে বিশুদ্ধ পানি পান করাবার অভিপ্রায়ে নলকূপের পানি পান করানোর অভ্যেস করাতে ৪০ বছর সময় লেগেছে। বর্তমানে (১৯৯৯) ৮০% লোক নলকূপের পানি পান করে। অথচ আর্সেনিক বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় ২৫% নলকূপ আর্সেনিক দোষে দুষ্ট, সেগুলোকে চিহ্নিত করতেও লাগবে ৯ বছর সময়। এর মধ্যে কত মানব সন্তান আর্সেনিকে আক্রান্ত হবে তা হিসেব করতে হয়তো কয়েক বছর লেগে যাবে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বাধিক সমস্যাগ্রস্ত হচ্ছে এদেশের নারী সমাজ। সন্তান গ্রহণের বা অগ্রহণের সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা তার নেই, অথচ নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থাও ৫০% এর ভাগ্যে জুটছেনা গ্রামীণ এলাকায়, শহরাঞ্চলে তা ২৯%। বেশীর ভাগ নারী গর্ভাবস্থায় পাচ্ছে না প্রয়োজনীয় খাবারটুকু, পুষ্টি চিন্তাতো কষ্ট কল্পনা মাত্র। বাংলাদেশের সকল ইউনিয়নে মা ও শিশুকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু অসুস্থ মহিলার পক্ষে ইউনিয়ন কেন্দ্রে পৌছানোর বাহন জোগাড় করা ও অর্থ ব্যয় এখনও সম্ভবপর হচ্ছে না ৪০% ক্ষেত্রে (মুহাম্মদ, ২০০০)। এ দেশে প্রতি ৪,২৫১ জনে হাসপাতালের ১টি শয্যা এবং প্রতি ৪,৫৯৯জনে ১জন ডাক্তার গড়ে বরাদ্দ রয়েছে (স্বাস্থ্য ও প. ক. মন্ত্রণালয়-১৯৯৯)।

দারিদ্রের গতি প্রকৃতি

১৯৯৬ সালের পরে অনাপেক্ষিক দারিদ্রের পরিমাপ তথ্য আর পাওয়া যায়নি। সেই তথ্য মতে ১৯৮৩-৮৪ সালের সঙ্গে তুলনা নিম্নরূপ ঃ

সারণি-৩

এলাকা ভিত্তিক দারিদ্র ও চরম দারিদ্র পরিমাপ (ক্যালোরি পরিমাপে) (শতকরা হারে)

প্রকৃতি	সাল	এলাকা		
		গ্রাম	শহর	জাতীয়
	১৯৮৩-৮৪	৬১.৯০	৬৭.৭০	৬২.৬
দারিদ্র	১৯৯৫-৯৬	৪৭.১০	৪৯.৭০	৪৭.৫
	১৯৮৩-৮৪	৩৬.৭০	৩৭.৪০	৩৬.৭৫
চরম দারিদ্র	১৯৯৫-৯৬	২৪.৬০	২৭.৩০	২৫.১০

সূত্র : খানা জরীপ-১৯৯৫-৯৬, বিবিএস

দ্রষ্টব্য ঃ ৯৫-৯৬ অর্থ-বছরের Cost of Basic Method দ্বারা উচ্চ পর্যায়ের দারিদ্রের হার ৫৩'১% এবং নিম্ন পর্যায়ের দারিদ্রের হার ৩৫.৬% পরিমাপিত হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন

বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টাকে নিচের চিত্রে দেখানো যেতে পারে :

চিত্র ঃ ২

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি

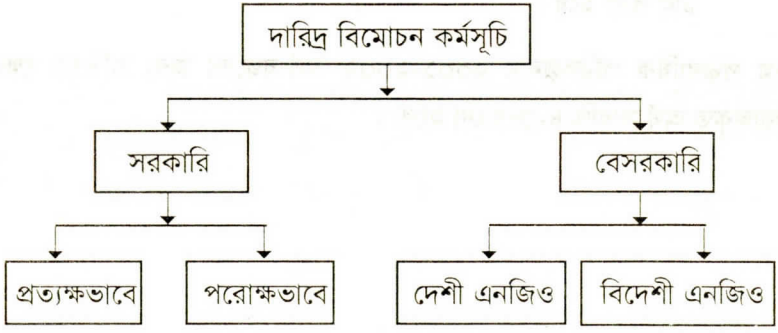

দারিদ্র বিমোচনে সরকারি পরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) গৃহীত নীতিসমূহের মধ্যে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। দারিদ্র বিমোচনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ পৃথক পৃথকভাবে এবং কখনও কখনও সমন্বিতভাবে কর্মসূচি পরিচালনা করবে।

২। সরকারি প্রতিষ্ঠান দারিদ্র বিমোচনে কতিপয় কর্মসূচি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) সঙ্গে বাস্তবায়ন করবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এনজিওদের কার্যক্রমে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩। দারিদ্র বিমোচনে 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। সরকারি সংস্থা ও এনজিওদের পক্ষ থেকে 'ক্ষুদ্র পর্যায়ের উৎপাদন ও শিল্প বিনির্মাণ'কে উৎসাহিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ঋণ জোগান দেয়া হবে। নীতি অনুসারে আত্ম-কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

৫। নারী উন্নয়নকে পর্যাপ্ত অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং ক্ষুদ্র ঋণ ও ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে সহায়তা করা হবে, যাতে তারা আত্ম-কর্মসংস্থান বেছে নিতে পারে।

৬। দারিদ্র পরিমাপের জন্য নিয়মিত ও সময় পরম্পরায় পরিবীক্ষণের পদ্ধতি চালু করা হবে।

৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০১-২০০২ অর্থ-বছরের জন্য কতিপয় ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ সারণি-৪-দেখানো হলো।

সারণি-৪

৫ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের জন্য কতিপয় ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বরাদ্দ অর্থ (মিলিয়ন টাকায়)

ক্ষেত্র	বরাদ্দকৃত অর্থ
গ্রামীণ উন্নয়ন	২৮,১০২.২৩
শিক্ষা	৩৬,০৮১.৮৬
স্বাস্থ্য	২০,৮৭৩.৩৫
জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	৬,৪৪৫.০০
সমাজকল্যাণ, মহিলা ও যুব উন্নয়ন	৪,৪৫.১৮

সূত্র ঃ ৫ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

দারিদ্র বিমোচনে প্রধান সরকারি কর্মসূচিসমূহ

১। নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

চরম দরিদ্র পরিবারসমূহকে অনাহার থেকে রক্ষা এবং তাদের পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে সহায়তার জন্য সরকার রাজস্ব বাজেট থেকে নিম্নলিখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

সারণি-৫

চরম দরিদ্রদের অনাহার থেকে রক্ষায় নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ও ব্যয় ১৯৯৯-২০০০ (কোটি টাকায়)

কর্মসূচি	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
কাজের বিনিময়ে খাদ্য	৮০৬.০০
গ্র্যাচুইশাস রিলিফ ও টেষ্ট রিলিফ (জিআর ও টিআর)	২৭২.০০
ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট	২২৮.০০
ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং	২২৯.০০

সূত্র ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০০

২। বিশেষ কর্মসুচি

(ক) দরিদ্রদের গৃহ নির্মাণ ঋণ ও অনুদান

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর থেকে ৯৯-২০০০ অর্থ-বছরের জন্য দরিদ্র পরিবারসমূহের গৃহ নির্মাণে ক্রমপুঞ্জিতভাবে স্বল্প সুদে ৪৩কোটি টাকা ঋণ প্রদান এবং সাড়ে ১০কোটি টাকা গৃহ নির্মাণ অনুদান হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি খাস জমিতে বাস্তহারা অসহায় পরিবারবর্গের বসবাসের জন্য 'আশ্রয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প মূলত ১৯৮৭ সালে 'গুচ্ছ গ্রাম' নামে ১৯৯১ সালে 'আদর্শ গ্রাম' নামে এবং ১৯৯৬ সাল থেকে 'আশ্রয়ন' নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে টিনের ছাদ ও আরসিসি খুঁটি দ্বারা নির্মিত ১টি ঘর এবং ২ থেকে ৫কাঠা পরিমাণ জমি প্রতিটি পরিবারকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে। বিগত ১৪ বছরে বাংলাদেশে মোট ৪২টি প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৩০,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। গৃহ নির্মাণ ঋণের মাধ্যমে ২২,০০০টি ঘর নির্মিত হয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার লোক আবাসন লাভ করেছে।

(খ) এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক কর্মসূচি

বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বন্ধকহীন ও স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের জন্য এই ব্যাংক চালু করা হয়েছে। মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত মোট ১৩৬৯ জন বেকার যুবককে ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) দুঃস্থ মহিলাদের অনুদান কর্মসূচি

কেবল তালাকপ্রাপ্তা, বিচ্ছিন্ন থাকা ও অসহায় মহিলাদের জীবন ধারণের জন্য এই কর্মসূচিতে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ-বছরে প্রায় ২ লক্ষ মহিলাকে এই অনুদান প্রদান করা হয় এবং ১৯৯৯-২০০০ অর্থ-বছরে এই কর্মসূচিতে ২৫কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(ঘ) গ্রামীণ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরএমপি)

১৯৮৩ সাল থেকে গ্রামীণ কাঁচা সড়ক মেরামতের জন্য মাসিক বেতন ভিত্তিতে ভূমিহীন দরিদ্র মহিলাদের নিয়োগের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এই কর্মসূচিতে করা হয়েছে। প্রতি ইউনিয়নে ১০জন মহিলাকে এই কর্মসূচিতে নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে ৪,১০০টি ইউনিয়নে মোট ৪১,০০০ ভূমিহীন দরিদ্র মহিলা এতে কর্মরত আছেন।

৩। বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণ প্রদান কর্মসূচি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে এই সরকারি কর্মসূচিতে দরিদ্র ও ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমিতি গঠনের মাধ্যমে বন্ধকহীন ও স্বল্পসুদে ১ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ দেয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে কিস্তিতে সুদসহ (১০% সরলসুদ) অর্থ জমা দিয়ে ১ বছরে ঋণ শোধ করতে পারলে পরবর্তী বছরে আবার ঋণ পায়। বিগত ১৪ বছর ধরে প্রতি বছর শোধ করে পুনঃ ঋণ গ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ৪৪০টি থানায় এই কর্মসূচি ব্যাপ্ত। এটি ১৯৮০ সাল থেকে কার্যরত এবং সর্ববৃহৎ সরকারি ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচি। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে ১,৪৬৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ।

৪। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বাংলাদেশ সরকারের এই দপ্তরটি নিরঙ্কুশভাবে মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্যাবলী হলো ঃ

(ক) নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন

(খ) নারীর পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানে সহায়তাকরণ।

(গ) বেসরকারি মহিলা সংগঠনসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি

(ঘ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইনী সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ২৩৬টি থানায় এর দপ্তর ও কর্মকর্তা রয়েছে এবং ঐ সব থানায় উপরি-উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে মোট ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫। সমাজসেবা অধিদপ্তর

বাংলাদেশের সামাজিক কল্যাণ, বেসরকারি সংগঠন ও ক্লাবসমূহের মাধ্যমে মানবিক উন্নয়ন, এতিমখানা পরিচালনা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন, কিশোর

অপরাধীদের সংশোধন, মাতৃকল্যাণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা, বয়স্কভাতা প্রদান, দুঃস্থ নারী পুনর্বাসন, গ্রামীণ সমাজসেবা এবং শহর সমাজকল্যাণ কর্মসূচি প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তর। বাংলাদেশের সকল থানায় এর দপ্তর ও কর্মকর্তা রয়েছে। গ্রামীণ সমাজ সেবার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে (বন্ধকহীন,স্বল্প ও সরলসুদে) আত্ম-কর্ম সংস্থানে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

৬। যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর

শিক্ষিত ও বেকার যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বন্ধকহীন স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে আত্ম-কর্ম সংস্থানে সরকারের এই সংস্থাটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি নবীন। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৮০টি থানায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবেএই সংগঠনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ট্রেড ভিত্তিক ও নিবিড় বলে প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রধানত মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী ও গাভী পালন, কুটির শিল্প, মৌমাছি চাষ, ভকেশনাল ট্রেনিং প্রভৃতি এর প্রশিক্ষণের অন্তর্গত।

এনজিও কার্যক্রম

১। বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (BRAC)

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও। দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের (বর্তমানে ৯৬% মহিলা) বিভিন্ন ট্রেডে ট্রেনিং প্রদান, বন্ধকহীন স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থান ও পেশায় উপকরণ সরবরাহ, কতিপয় ক্ষেত্রে বিপণন সহায়তা, গবাদি-পশু, হাঁস-মুরগী, মৌমাছি পালন প্রকল্পসমূহে কারিগরী ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, কৃষিকর্মে উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ দ্বারা ঋণ গ্রহীতা এবং আগ্রহী জনগণকে সহায়তা প্রদান এই এনজিওটির প্রধান কর্মসূচি। এছাড়া দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নেও এর ভূমিকা পালন উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ৪১৮টি থানায় এই এনজিও কর্মরত। বর্তমানে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং শিশু স্বাস্থ্য, ইপিআই ও ডায়রিয়া নির্মূল কর্মসূচিতে সরকারের উন্নয়ন সঙ্গী হিসেবে কার্যরত। ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত এর উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৪৩ লক্ষ।

২। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বন্ধকহীন ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এই এনজিওটির

একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। তবে এর বাইরে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এর অন্যান্য কর্মসূচি হচ্ছে; মৎস্য চাষ ও পশুপালন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, রেশম প্রকল্প, সেচ প্রকল্প, সামাজিক বনায়ন, নলকূপ বিতরণ প্রভৃতি। নারী সচেতনায়ন ও ক্ষমতায়নসহ নির্যাতিতা নারীর আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এর অভীষ্ট লক্ষ্য। বাংলাদেশের ৯৭টি থানায় ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত এই এনজিও মোট ১৩.৩ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ৯৮৪.৪ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিতভাবে) ঋণ বিতরণ করেছে।

৩। এ্যাসোশিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ASA)

এই এনজিওটি গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের বন্ধকহীন ও স্বল্প সুদে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে থাকে। বার্ষিক মেয়াদী ঋণ সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারলে দরিদ্র মহিলাগণ পুনরায় ঋণ পেয়ে থাকে। এদের রিকোভারি রেট শতকরা ১০০ ভাগ। ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ দরিদ্র মহিলার মধ্যে আশা ২১৮৯.৬০ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিতভাবে) ঋণ বিতরণ করেছে।

৪। স্বনির্ভর বাংলাদেশ

এই এনজিওটির মূল লক্ষ্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে দরিদ্র মহিলাদের আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। অবশ্য ৩০% ক্ষেত্রে দরিদ্র পুরুষদেরকেও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট প্রায় ৫ লক্ষ দরিদ্র নারী-পুরুষের মধ্যে ২০৪.৯ কোটি টাকার (ক্রমপুঞ্জিতভাবে) ঋণ বিতরণ করেছে।

৫। কারিতাস সার্বিক মানব উন্নয়ন সংগঠন

খৃষ্ট-ধর্মানুসারী দরিদ্র নারী পুরুষকে ক্ষুদ্র ঋণ, অনুদান ও দুর্যোগকালে ত্রাণ প্রদানের জন্য এই সংগঠনটির সৃষ্টি হয়। পরে তা বাংলাদেশের সকল ধর্মানুসারী নারী-পুরুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই সংগঠন বাংলাদেশের যে সকল থানায় কর্মরত রয়েছে, তার সব ক'টিতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি আজও গ্রহণ করেনি। তবে কর্মরত থানাসমূহে দরিদ্র নারী (প্রধানত) ও পুরুষদের জন্য সামাজিক শিক্ষা ও দুর্যোগকালীন অনুদান প্রদান কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এই সংস্থাও বন্ধকহীন

ও স্বল্প সুদ (১২%) সরল সুদ) গ্রহণ করে থাকে। দরিদ্রদের বিভিন্ন ট্রেড ট্রেনিং ও প্রদান করে।

৬। গ্রামীণ ব্যাংক

এই সংস্থাটি এনজিও হিসেবে ১৯৭৯ সালে যাত্রারম্ভ করে। গঠিত দলে দরিদ্র মহিলা ও পুরুষকে ক্ষুদ্রঋণ (বন্ধকহীন ও স্বল্পহারে সরল সুদে) প্রদান পূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থানই ছিল এর মূল লক্ষ্য। অন্যান্য এনজিওসমূহ প্রধানত গ্রামীণ ব্যাংকের আদর্শেই ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সরকার এটিকে ব্যাংকিং সেক্টরের আওতাভুক্ত করেছে। ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত বাংলাদেশে এর ১২৪৩টি শাখা গঠিত হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত হিসাবে ১৪,৮০৩.২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। শতকরা ৯৫ ভাগ উপকারভোগী হচ্ছে দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলা, এদের মোট সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ।

দারিদ্র বিমোচনে কতিপয় সুপারিশ

দারিদ্র যে কোন একটি দেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রবহমান সুযোগহীনতা, অসম বন্টন ও শোষণের অবশ্যম্ভাবী ফল। এটির অবসান ঘটানো বা দূরীকরণ প্রায় অসম্ভব। বরঞ্চ একে হ্রাসকরণ বা বিমোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে সেক্ষেত্রেও গ্রহণ করতে হয় সুদূর প্রসারী, সর্বাত্মক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। প্রত্যক্ষ কর্মসূচি (যেমন আশ্রয়ণ ও ক্ষুদ্র ঋণ কমূসূচি) যতটা সহায়তা করে, তার চেয়ে পরোক্ষ কর্মসূচি (যেমন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, গ্রামীণ উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ) দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে দারিদ্র বিমোচনে অধিক কার্যকর বিবেচিত হয়। শ্রীলংকা শিক্ষার হার বৃদ্ধি (৯৯%) এবং নিয়োগ ও সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্রুত দারিদ্র বিমোচনে অগ্রগতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্রের হার ৪৭.৫%, অপরপক্ষে শ্রীলংকায় তা ২৭% মাত্র।

বাংলাদেশে দারিদ্র দূরীকরণে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

(ক) শিক্ষার হার বৃদ্ধি ঃ বর্তমানে অর্জিত ৬২% হারকে আগামী ১০ বছরে ১০০% এ উন্নীত করতে হবে।

(খ) নিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঃ কেবল শিক্ষার প্রসার ঘটালেই চলবেনা, সেই সঙ্গে দেশে নিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা হলে অথবা বিদেশে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হলে দারিদ্রের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

(গ) গণতন্ত্রের বিকাশ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হলে মানুষের জীবন যাপনে অস্থিরতা দূরীভূত হয় এবং আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র হ্রাস পায়।

(ঘ) সরকারি ও এনজিও কার্যক্রমে কার্যকর সহযোগিতা সৃষ্টি ঃ পরস্পরকে বিপক্ষ ভাবা এবং সন্দেহের অবকাশ রাখার ফলে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে কোন পক্ষের কার্যক্রমেই স্থায়িত্ব পাচ্ছে না। এছাড়া কার্যক্রমের দ্বিত্বতা সৃষ্টি সফলতায় বাধা সৃষ্টি এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুফল লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঙ) সরকারি সংস্থায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের হার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বর্ধন ঃ সরকারি সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি, সমাজ সেবা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর প্রত্যক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত। এগুলোর মধ্যে যুব উন্নয়নের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং বিআরডিবির সামান্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। সমাজ সেবা ও মহিলা বিষয়ক অধিপ্তরে প্রশিক্ষণ আরম্ভ এবং বিআরডিবিতে পর্যাপ্ত ট্রেড প্রশিক্ষণ এবং আরও অধিকহারে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হলে গ্রামীণ জনগণ নিজেরাই তাদের দারিদ্রের মোকাবিলায় সমর্থ হবে।

(চ) নারীর ক্ষমতায়ন ঃ বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জন গোষ্ঠী নারী। এদেরকে আত্ম-কর্সসংস্থানসহ যে কোন পেশায় নিযুক্ত হবার মত শিক্ষা ও মূলধন দিয়ে উপযুক্ত করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং তা সর্বত্র প্রসারিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মের সুযোগ তাদের দিয়ে নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হলে দারিদ্রের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে।

(ছ) দুর্নীতি দূরীকরণ ঃ বাংলাদেশের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আজ স্থায়ী আসন নিয়ে বসে আছে। সকল ক্ষেত্র থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি (কেবল আর্থিক নয়) দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হলে দারিদ্র অর্ধেক হ্রাস পাবে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের

প্রতিবেদনে (২০০০) উল্লেখ করা হয় যে, "দুর্নীতি দূর হলে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হবে।" কেবল দুর্নীতির কারণেই অগ্রসরমান দরিদ্র সমাজ একই বৃত্তে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে।

(জ) সামাজিক উন্নয়ন ঃ সমাজে কল্যাণমূলক সরকারি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বিষয়টি সুদুর প্রসারী। এর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ প্রেম এবং উন্নয়নমূলক অঙ্গীকার নিহিত রয়েছে। তবে সরকার যদি সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে এবং রাষ্ট্র যন্ত্র যদি নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে,তাহলে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত হয়, অঙ্গীকার শাণিত হয়। ফলে দারিদ্র বিমোচন সহজ ও দ্রুত হয়ে থাকে।

উপসংহার

বাংলাদেশ সরকার বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মঙ্গলার্থে দারিদ্র বিমোচনের যে সকল নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তার উল্লেখযোগ্য অংশই বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। অবশ্য কেয়ার, নোরাড, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার অর্থায়নও উল্লেখযোগ্য। ২০০০-২০০১ সালে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন প্রয়োজন শুধু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার উন্নতি সাধন। অবশ্য সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থাও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রথমত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন, যা দক্ষ শ্রমিক চাহিদা বৃদ্ধি করে।

দ্বিতীয়ত, মৌল দ্রব্য ও সেবাদির সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিতকরণ, যাতে দারিদ্র সীমার নিচের অংশের জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নত হয় এবং তাদের উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে যতদিন কর্মসংস্থান ও নিয়োগের মাধ্যমে বেকার, সাময়িক বেকার ও ছদ্ম বেকারদের কর্মের সংস্থান না হবে, ততদিন দারিদ্র বিমোচন ফলপ্রসূ হবেনা। কর্ম-সংস্থানের মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থান অর্থনীতিবিদদের মতে এ দেশে অধিকতর উপযোগী।ববেচিত হয়। সে লক্ষ্যে অগ্রসর হলে দারিদ্র বিমোচন কাঙ্ক্ষিত ফল দানে সমর্থ হতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

তারেক, ড. মোহাম্মদ ও নাসিরুদ্দিন (সম্পা.)। ***উন্নয়ন অর্থনীতি ঃ বাংলাদেশ পরিপেক্ষিত।*** বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০০১। ***পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ ১৯৯৯***। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মিলি, বেগম রোকসানা ও রহমান মো. লুৎফর। ২০০। **গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ম.বি.অ.-এর প্রকল্পের কার্যকারিতা।** *লোক প্রশাসন সাময়িকী,* ১৬শ সংখ্যা, বিপিএটিসি, ঢাকা।

মুহাম্মদ, আনু। ১৯৯৯। ***উন্নয়ন ধারার ২৭ বছর ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ।*** *লোক প্রশাসন সাময়িকী,* ১৪শ সংখ্যা, বিপিএটিসি, ঢাকা।

মোস্তাকীম, গোলাম। ১৯৯৫। ***বাংলাদেশে দারিদ্রের স্বরূপ।*** লোক প্রশাসন সাময়িকী, ৪র্থ সংখ্যা, বিপিএটিসি, ঢাকা।

হক, তৃণা। ১৯৮৮। ***বাংলাদেশে দারিদ্রের গতি প্রকৃতি ঃ পরিসংখ্যান ভিত্তির পর্যালোচনা।*** বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ঢাকা।

BRAC. 2000. Annual Report. BRAC Press, Dhaka.

Department of Women Affairs. 2000. ***The Annual Report.*** Dhaka.

Department of Social Service. 2000. ***The Annual Report.*** Dhaka.

Government of Bangladesh. 1998. ***The Fifth Five year Plan. M/O Planning,*** Dhaka.

Government of Bangladesh. 2000. ***Annual Report. M/O Finance,*** Dhaka.

Jones, S. 1976. ***An Evaluation of Rural development Programmers in Bangladesh.*** *The Journal of Social Studies, No. 6, pp.51-62.*

Sadeque, M. 1990. ***Survival Pattern of the Rural Poor : A Case Study of a Village of Bangladesh.*** Northern Book Center, New Delhi.

Seen, Amartya. 1984. ***Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation.*** Oxford Calendar Press, U.K.

Stratton, Paul. 1999. ***Poverty Concepts and Measurement.*** *Harvard* University Press, USA.

UNICEF, BBS. 1994. *Progotir Pithy :* ***Progress Towards the Achievement of the Goals for the 1999s.*** Pioneer Printing Press, Dhaka.

World Bank.-2000. *Bangladesh :* ***Food and Nutrition Sector Review. Report No. 5312-BD.*** Dhaka.